بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১লা জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ নববর্ষের প্রথম দিন, আর এটি আরম্ভ হচ্ছে জুমুআর আশিসময় দিনের মাধ্যমে। ঐতিহ্যগতভাবে আমরা পরস্পরকে নববর্ষের সূচনাতে শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকি। আমাকেও জামাতের বন্ধুদের পক্ষ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা পাঠানো হচ্ছে। আপনারাও পরস্পরের মাঝে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকবেন। পাশ্চাত্যে বা উন্নত আখ্যায়িত হয় এমন দেশসমূহে পুরোনো বছরের শেষ দিনের দিবাগত রাত্রে সারা রাত আনন্দ-উল্লাশ, হৈ-হুল্লোড়, আতশবাজি ফুলঝুড়ি যেটিকে ফায়ার ওয়ার্ক বলা হয়, এসবের মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করা হয় বরং আজকাল মুসলমান বিশ্বেও নববর্ষকে এভাবেই স্বাগত জানানো হয়। যেমন গতকাল দুবাই থেকে এভাবেই ফুলঝুড়ি বা ফায়ার ওয়ার্কের সংবাদ আসছিল যেখানে এসব তামাশা প্রদর্শিত হওয়ার ছিল আর একই সাথে একটি তেষট্টি তলা ভবনে আগুন লাগার দৃশ্যও দেখানো হচ্ছিল যা পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়। কিন্তু টেলিভিশনে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিল, এই হোটেলে বা এই বিল্ডিংয়ে আগুন লাগলেও কিছু যায় আসে না, এটি পুড়ে গেলে পুড়ুক আমরা তো সেই জায়গার সামনেই বা পাশে, পরিকল্পনা অনুসারে ফুলঝুড়ি অর্থাৎ আতশবাজি বা ফায়ার ওয়ার্ক পরিচালনা করব, আনন্দ উল্লাস হবে। বর্তমানে মোটের ওপর অধিকাংশ মুসলমান দেশের অবস্থাই শোচনীয়। কিন্তু যাহোক এটি যাদের কাছে টাকা আছে সেসব দেশের মানুষের পক্ষ থেকে বস্তুবাদিতার বহিঃপ্রকাশ। আগুন সেখানে না লাগলেও অবস্থার দাবি ছিল, সম্পদশালী মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর এই ঘোষণা দেয়া যে, আমরা এসব বাজে কাজের পিছনে অর্থ অপচয় করার পরিবর্তে সমস্যাকবলিত এবং প্রভাবিত মুসলমানদের সাহায্য করব। কিন্তু এখানে নিজেদের শিক্ষা তারা বেমালুম কীভাবে ভুলে গিয়েছে তা দেখুন! কিছুদিন পূর্বেই দুবাই থেকে এই সংবাদ আসে যে, তাদের সবচেয়ে বড় হোটেলে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্রিসমাস ট্রি রাখা হয়েছে যার মূল্য প্রায় এগার মিলিয়ন ডলার বা এক কোটি দশ লক্ষ ডলার। এই হলো সম্পদশালী মুসলমান দেশগুলোর অগ্রাধিকার বা প্রবণতা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীদের অনেকেই এমন আছেন যারা নিজেদের রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন বা অনেক স্থানে ভোররাতে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে নফলের মাধ্যমে নববর্ষের প্রথম দিনের সূচনা করেছেন। এছাড়া বহুস্থানে জামাতবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ নামাযও পড়া হয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও এসব মুসলমানের দৃষ্টিতে আমরা অ-মুসলমান আর এসব হৈহুল্লোড়কারী ও অপব্যায়কারী এবং অমুসলমানদের সামাজিক কু-প্রথার অন্ধ অনুকরণকারীরা মুসলমান।

যাহোক আমরা আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় মুসলমান আর কারো কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, তবে হ্যাঁ আমরা যদি কোন সনদের বাসনা রাখি

তবে তাহলো, খোদার দৃষ্টিতে সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সনদ অর্জন করা আর এর জন্য আমরা শুধুমাত্র বছরের প্রথম দিন ব্যক্তিগত বা জামাতবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ পড়লাম বা সদকা করলাম বা অন্য কোন পুণ্য করলাম আর এর মাধ্যমেই আমাদের খোদার সন্তুষ্টি লাভের অধিকার অর্জন হয়ে যাবে, এমনটি নয়। নিঃসন্দেহে এটি পুণ্য। নিঃসন্দেহে এই পুণ্য খোদার কৃপাবারি আকর্ষণের কারণও হতে পারে। কিন্তু তখনই সম্ভব যদি এতে অবিচলতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার কাছে স্থায়ী পুণ্য চান। আল্লাহ্ তা'লা চান, বান্দা স্থায়ীভাবে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলবে, সৎকর্মশীল হবে। নামায এবং তাহাজ্জুদের পাশাপাশি হৃদয়ে এক পবিত্র বিপ্লব আনয়নেরও প্রয়োজন রয়েছে, কেবল তবেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন। এমন কোন পুণ্য যা শুধু একদিন বা দু'দিন করা হয় তবে তা কোন পুণ্য বা নেকী নয়, তাই আমাদের এটি ভাবতে হবে, আমাদের কর্ম বা আচার-আচরণ কেমন বা কিরূপ হওয়া উচিত যা খোদার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এজন্য আজ আমি যুগের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের কিছু নসীহত বা উপদেশাবলী নিয়ে এসেছি যা তিনি বিভিন্ন সময় জামাতকে করেছেন যেন অবিচলতার সাথে ও অব্যাহতভাবে আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে যেতে পারি। এই কথাগুলো কেবল বছরের প্রথম দিনই নয় বরং বছরের বারো মাস এবং ৩৬৫ দিনকে আশিসমন্ডিত করবে আর আমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পারব, খোদার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

পৃথিবীর অবস্থা দেখ! আমাদের মহা সম্মানিত রসূল (সা.) নিজ কর্মের দর্পণে এটিই তুলে ধরেছেন যে, আমার জীবন-মরন সবই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। অপর দিকে আজ পৃথিবীতে যত মুসলমান রয়েছে তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কি মুসলমান? তাহলে সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার নামে কলেমা পাঠ করে তাঁর জীবনের সকল নীতি নিবেদিত ছিল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু এরা বস্তু জগতের জন্য জীবন যাপন করে (এরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বস্তু জগতের জন্য জীবন যাপন করে) আর এর পিছনেই বা এর জন্যই মৃত্যু বরণ করে। তাদের এই অবস্থা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত না এসে যায়। দুনিয়াই তার উদ্দেশ্য, প্রেমাস্পদ এবং লক্ষ্য হয়ে থাকে। অতএব এমন পরিস্থিতিতে একথা বলা কীভাবে সত্য-সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে যে, আমি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করি। তিনি বলেন, এটি প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়, এটিকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখবে না, মুসলমান হওয়া তত সহজ বিষয় নয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য এবং ইসলামের উত্তম নমুনা যতদিন তোমার মাঝে সৃষ্টি না হবে ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পার না; (যতদিন এটি না হবে) কেবল বাহ্যিকতা বা খোলসই সার। যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া মুসলমান হওয়ার দাবি কর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্‌র যদি অনুসরণ না কর, কুরআনী শিক্ষার যদি অনুসরণ না কর, তাহলে নাম এবং খোলস নিয়ে আনন্দিত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদি অনুসরণ না কর তাহলে শুধু ছিলকা বা খোলস নিয়েই তুমি লম্ফঝম্ফ করছো। কোন ইহুদীকে কোন মুসলমান বলে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সেই ইহুদী বলে, তুমি শুধু

নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ো না, আমি আমার ছেলের নাম খালিদ রেখেছিলাম কিন্তু সূর্য ডোবার পূর্বেই তাকে কবর দিয়ে দেই। (খালিদের অর্থ হলো, দীর্ঘজীবি হওয়া বা স্থায়ী জীবন লাভ করা কিন্তু নাম রাখার কারণেই সে দীর্ঘজীবন লাভ করেনি, সে তো একদিনও জীবিত থাকতে পারলো না) তাই সত্য সন্ধান কর, শুধু নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। কত লজ্জাস্কর বিষয় যে, মানুষ সুমহান রসূল (সা.)-এর উম্মতী আখ্যায়িত হয়ে কাফিরদের মতো জীবন যাপন করবে। তোমরা নিজেদের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ তুলে ধর এবং সেই অবস্থা সৃষ্টি কর। দেখ! যদি অবস্থা তা না হয় তাহলে তোমরা তাগুত বা শয়তানের অনুসরণ করছ আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছ।

বস্তুত একথা খুব সহজেই বোধগম্য যে, খোদার প্রেমাস্পদ হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা যতদিন খোদার প্রিয় না হবে, খোদার ভালোবাসা লাভ না হবে ততদিন সফল জীবন যাপন করতে পারবে না, আর এরূপ পরিস্থিতি ততক্ষণ সৃষ্টি হবে না যতক্ষণ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও ইতায়াত না করবে। মহানবী (সা.) ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম কাকে বলে। অতএব তোমরা সেই ইসলাম নিজেদের মাঝে সৃষ্টি কর যেন খোদার প্রিয়ভাজন বা প্রেমাস্পদ হতে পার।

ইসলাম জাগতিক নিয়ামত উপার্জনে বারণ করে না বরং পৃথিবীতে বসবাস করেও ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার পরামর্শ দেয়। এ সম্পর্কে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করতে বারণ করেছে, এটি ভীরুদের কাজ। এই জগতের সাথে মু'মিনের সম্পর্ক যত ব্যাপকতর হয় ততই তা তার পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার কারণ হয় কেননা; ধর্মই তার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। এই ইহজগত, এর ধন-সম্পদ ও সম্মান ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। আসল কথা হলো, এই বস্তুজগত যেন মূল লক্ষ্য না হয় বরং জাগতিক আয় উপার্জনের মূল উদ্দেশ্যও ধর্ম হওয়া উচিত। অতএব জাগতিক আয়-উপার্জন এমনভাবে করা উচিত যেন তা ধর্মের সেবাদাস বা সেবক হয়। যেভাবে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সফরের জন্য বাহন এবং পাথেয় সঙ্গে নিলেও তার আসল উদ্দেশ্য সেই বাহন বা পাথেয় নয় বরং গন্তব্যে পৌঁছা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষ জাগতিক আয়-উপার্জন করতে পারে কিন্তু একে ধর্মের সেবক বিবেচনা করে করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (সূরা আল্ বাকারা: ২০২)। আল্লাহ্ তা'লা এই যে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً -র শিক্ষা দিয়েছেন এতেও এই দুনিয়া বা ইহজগতকে অগ্রগণ্য করেছেন কিন্তু কোন দুনিয়াকে? 'হাসানাতুদ্ দুনিয়া'কে, যা পরকালে হাসানাত বা কল্যাণ বয়ে আনবে। (এমন দুনিয়াকে অগ্রগণ্য করেছেন অর্থাৎ সেই দুনিয়া অর্জন কর যা পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হবে) এই দোয়ার শিক্ষা থেকে স্পষ্টভাবে বোধগম্য যে, ইহজাগতিক আয় উপার্জনের পিছনে মু'মিনের 'হাসানাতুল আখিরাহ্' অর্থাৎ পারলৌকিক

কল্যাণকে অগ্রগণ্য রাখা উচিত। একই সাথে 'হাসানাতুদ্ দুনিয়া' শব্দে জাগতিক আয়-উপার্জনের সেসব উত্তম মাধ্যমগুলো ব্যবহারের কথা এসে গেছে যা জাগতিক আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে মু'মিনের অবলম্বন করা উচিত। ইহজাগতিক আয় উপার্জনের জন্য এমন সকল মাধ্যমে কর যা অবলম্বন করলে পুণ্য হয় বা নেকী হয় বা যা উত্তম, এমন কোন নীতি নয় যা কোন মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে আর তা স্বশ্রেণীর মাঝে কোন লজ্জার কারণও যেন না হয়। এমন জাগতিক আয়-উপার্জন অবশ্যই পারলৌকিক পুণ্যে পর্যবসিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, এমন জাগতিক আয়-উপার্জন কর যার ফলে কারো যা অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়, যা অবলম্বনে স্বশ্রেণীর মাঝে লজ্জিত হতে না হয়। তাহলে তোমাদের এমন জাগতিক কার্যকলাপ পরকালের পুণ্যে পর্যবসিত হবে আর একেই খোদা পছন্দ করেছেন।

তিনি (আ.) আরও বলেন, জাহান্নাম কাকে বলে এটি বুঝতে হবে। এক জাহান্নাম হলো সেটি যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জাহান্নাম। দ্বিতীয়তঃ এই জীবনও বা ইহজীবনও যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য অতিবাহিত না হয় তাহলে এটিও জাহান্নামই। যদি এতে হাসানাত বা কল্যাণ না থাকে তাহলে এই ইহজীবনও জাহান্নাম হতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার এবং তার সুখের কোন নিশ্চয়তা দেন না বা দায়িত্ব নেন না। তিনি (আ.) বলেন, একথা মনে করো না যে, কোন বাহ্যিক ধন-সম্পদ বা রাজত্ব, সম্মান, অজস্র সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির জন্য আরাম বা প্রশান্তি বয়ে আনে আর সে দুনিয়াতেই জান্নাতী হয়ে যায়; মোটেই নয়। সেই প্রশান্তি, সেই স্বস্তি, সেই সুখ যা জান্নাতের নিয়ামতরাজির অন্তর্গত তা এসব কথার মাধ্যমে অর্জন হয় না বরং তা খোদার জন্য জীবিত থাকা এবং মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে যার জন্য নবীরা, বিশেষ করে ইব্রাহীম এবং ইয়াকূব (আ.) প্রমুখের এই নসীহতই ছিল যে, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (সূরা আল্ বাকারাঃ ১৩৩)। জাগতিক ভোগবিলাসও এক ধরণের নোংরা লিপ্সা সৃষ্টি করে চাহিদা ও পিপাসাকে বৃদ্ধি করে। জাগতিক ভোগবিলাস ও জাগতিক আনন্দ এক ধরণের লোভ লিপ্সা সৃষ্টি করে। যেভাবে একটি রোগ হিসাবে পিপাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে তদ্রুপে সেই পিপাসাও বাড়ে। তিনি (আ.) বলেন, ইসতিসকার রোগীর মতো তার পিপাসার নিবারণ হয় না এবং এক পর্যায়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব এই বৃথা কামনা-বাসনা এবং আক্ষেপের অগ্নিও সেই জাহান্নামের অগ্নিরই অন্তর্গত যা মানুষের হৃদয়কে কোনভাবে শান্তি বা প্রশান্তি পেতে দেয় না বরং তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ ও ব্যাকুলতার মাঝে দিশেহারা ছেড়ে দেয়। তাই এই বিষয়টি আদৌ যেন আমার বন্ধুদের দৃষ্টির আড়ালে না যায় যে, মানুষ ধন-সম্পদ, নারী বা সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় এবং নেশায় এমন উন্মাদ এবং পাগল যেন না হয়ে যায় যে, তার এবং খোদার মাঝে এক পর্দা এসে যাবে বা দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

এরপর তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়েছে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ থেকে প্রমাণিত যে, মানুষের এই সকল গুণাবলী অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ সকল গুণাগুণ খোদা তা'লারই যিনি রাব্বুল আলামীন বা বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক

অর্থাৎ সকল বিশ্বে যেমন শুক্রানু ও মাংস পিন্ডে তথা সকল বিশ্বে এক কথায় সকল বিশ্বের বা সকল জগতের তিনি প্রভু-প্রতিপালক। এরপর রয়েছে রহমান, রহীম এবং মালিকে ইয়াওমিদ্বীন। ইয়াকা না'বুদু যে বলে এর অর্থ হলো, সেই ইবাদতে রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত এবং মালিকিয়্যত গুণাবলীর প্রতিফলন মানুষের নিজের মাঝে গ্রহণ করা উচিত, (আল্লাহ্ তা'লার এসব গুণাবলী নিজেদের জীবনে ধারণ করা উচিত)। মানুষের পরম দাসত্ব হলো, **'তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ্'** অর্থাৎ খোদার রঙে রঙীন হয়ে যাওয়া, সেসব গুণ অবলম্বন করা উচিত। যতক্ষণ এই পর্যায়ে না পৌঁছবে ক্লান্ত বা শ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এরপর এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যা খোদার ইবাদতের দিকে তাকে আকৃষ্ট করে, (এই অবস্থা বা এই গুণাবলী যদি নিজের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর খোদার ইবাদতই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য) আর সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যা وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (সূরা আন্ নাহল: ৫১) এর অবস্থা (অর্থাৎ মানুষ তখন ফিরিশতাসদৃশ হয়ে যায়)।

জীবনের কোন ভরসা নেই, তাই সবসময় মৃত্যুকে সামনে রাখ বা মৃত্যুকে স্মরণ রাখ, তবেই খোদার নির্দেশ মেনে চলা সম্ভব এবং সেই গুণাবলী অবলম্বন করা সম্ভব, এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কেউ জানেনা যে, সে যোহরের পর আসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কি-না?। অনেক সময় হঠাৎ করে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়। অনেক সময় ভালো এবং সুস্থ মানুষও হঠাৎ মারা যায়। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মন্ত্রী মুহাম্মদ হাসান খান সাহেব বাহির থেকে হাওয়া খেয়ে আসেন এবং সানন্দে সিঁড়ি মাড়িয়ে উপরে যাচ্ছিলেন। তখন হয়তো সিঁড়ির দু'একটি ধাপই অতিক্রম করে থাকবেন, তখন মাথা ঘুরে উঠে আর তিনি বসে পড়েন। চাকর এসে বলে, আমি কি আপনাকে সাহায্য করব? তিনি বলেন, না। এরপর আরো দু'তিনটি ধাপ অতিক্রম করতেই পুনরায় মাথা ঘুরে উঠে এবং এরই সাথে তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়। একইভাবে তিনি আরেক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যিনি হলেন, গোলাম মহিউদ্দিন। তিনি কাশ্মীর কাউন্সিলের মেম্বার। তিনিও হঠাৎ করেই ইহধাম ত্যাগ করেন। এক কথায় মৃত্যু কখন আসবে আমরা জানি না। তাই আবশ্যক হলো, এ সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া। অতএব ধর্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অনেক বড় বিষয় যা মৃত্যু যন্ত্রনার মুখে মানুষকে সফলকাম করে। পবিত্র কুরআনে আছে, إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (সূরা আল্ হাজ্জ: ২)। السَّاعَةِ বলতে হয়তো কিয়ামতও হবে। আমরা এটি অস্বীকার করবো না কিন্তু এতে মৃত্যু-যন্ত্রণাই বোঝায় কেননা; সেটি পূর্ণ বিচ্ছেদের সময় হয়ে থাকে, মানুষ তখন তার পছন্দনীয় এবং প্রিয় জিনিষ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ করে তার জীবনে যেন এক বিস্ময়কর ভূমিকম্প এসে যায়। আভ্যন্তরীণ ভাবে যেন কোন গ্যাঁড়াকলে আবদ্ধ থাকে। তাই মানুষের সমূহ সৌভাগ্য মৃত্যুকে স্মরণ রাখার মাঝে নিহিত। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, মৃত্যু যন্ত্রণায় যখন কাতর থাকে বা অনুরূপ অবস্থা যখন মানুষের ওপর বিরাজ করে এমন পরিস্থিতিতে আসল বিষয় এটিই অর্থাৎ মৃত্যুকে সামনে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয় হলো, মৃত্যুকে তার সামনে রাখা আর ইহজগত এবং ইহজাগতিক বিষয়াদি

তার কাছে যেন এতটা প্রিয় না হয় যা শেষ মুহূর্তে বা বিদায়ক্ষণে তার কষ্টের কারণ হতে পারে। আর মৃত্যুর কথা যদি স্মরণ থাকে তাহলে মানুষ সৎকর্ম করারও চেষ্টা করবে। তখন সে বৃথা খেলতামাশার পিছনে সময়ও নষ্ট করবে না আর অর্থও নয় আর অযথা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অপব্যয়ও করবে না।

এরপর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, ধৃষ্ট হয়ো না। ইস্তেগফার এবং দোয়ায় রত হও আর এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন কর। উদাসীনতা প্রদর্শনের আর সময় নেই। অবাধ্য প্রবৃত্তি মানুষকে মিছে আশা দিয়ে থাকে যে, তোমার জীবন দীর্ঘ হবে। মৃত্যুকে সন্নিকটে জ্ঞান কর। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা সত্য। যে অন্যায়ভাবে খোদার প্রাপ্য অন্য কাউকে দেয় সে লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে সূরা ফাতিহায় তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই তিনটির স্বাদই তিনি আস্বাদন করাবেন। এতে যারা শেষে ছিল তারা প্রথমে এসে গেছে অর্থাৎ যাল্লিন। অর্থাৎ যারা যাল্লিন ছিল, সূরা ফাতিহায় যাদের কথা শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা প্রথমে এসে গেছে। তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম ছিল যে, কোন যুগে একজন মুরতাদ হলেও কিয়ামত এসে যেত। আর এখন তাঁর যুগে বিশ লক্ষ মুসলমান ইসলাম ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে আর ইসলাম পরিত্যাগের কারণে তারা নিজেরা অপবিত্র হয়েছে। অথচ নিজের অপবিত্রতার কথা ভুলে গিয়ে তারা এক পবিত্র সত্তাকে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়, তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলে। মাগযুব বা কোপগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ দেয়া হচ্ছে প্লেগের মাধ্যমে। প্লেগও একটি আযাব বা শাস্তি। এটি তাদের ওপর নিপতিত হয় যারা খোদার ক্রোধভাজন হয়। আজকের যুগেও তুফান আসছে, ভূমিকম্প দেখা দিচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ রয়েছে। মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে স্পষ্ট হয় যে, খোদার ক্রোধ বর্ষিত হচ্ছে, গযব নাযিল হচ্ছে আর এই বিষয়গুলোই মানুষকে খোদার দিকে নিয়ে আসে, চেতনাবোধ জাগ্রত করে যে, তার আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং এই গযব থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, এরপর أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর শ্রেণী রয়েছে। এটি খোদার চিরন্তন রীতি, তিনি যখন কোন জাতিকে সম্বোধন করে বলেন, এ কাজ করবে না তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই জাতির একটি শ্রেণী খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যদি বলেন, এই কাজ করবে না তাহলে এর অর্থ হলো এক শ্রেণীর মানুষ অবশ্যই সেই কাজ করবে। আল্লাহ্ তা'লা এখানে সতর্ক করছেন, তোমরা এটি করবে কিন্তু করো না কেননা, করলে এর শাস্তি পাবে। এমন একটি জাতি দেখাও যে জাতিকে বলা হয়েছে, এই কাজ করো না আর তারা তা করেনি। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখাও। কোন জাতিকে যদি বলা হয়, এই কাজ করো না তখন সেই জাতি অবশ্যই সে কাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের বলেছিলেন, তোমরা বাইবেলে, তওরাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করো না অথচ তারা তা করেছে, তাতে প্রক্ষেপণ করেছে। কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই কথা বলেন নি যে, কুরআনে পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে না বরং বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল্ হিজর:১০)। বস্তুতঃ দোয়ায় নিয়োজিত থাক যেন আল্লাহ্ তা'লা أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বা পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। অতএব পুরস্কারপ্রাপ্তদের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য দোয়ার প্রয়োজন আর কেবল এক দিন বা দু'দিনের দোয়া নয় বরং অনবরত দোয়া করা উচিত।

এরপর পবিত্র পরিবর্তন এবং তাক্বওয়ার ফলশ্রুতিতে পরকালের চিন্তা আসে আর তাক্বওয়াই মানুষকে পরকালে সফল করে বা পরজীবনে সাফল্য বয়ে আনে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যারা মুত্তাকী তাদের ওপর খোদার একটি তাজাল্লী বা বিকাশ ঘটে থাকে। তারা খোদার ছায়ায় জীবন যাপন করে। কিন্তু তাক্বওয়া বিশুদ্ধ এবং খাঁটি হওয়া উচিত, শয়তানের কোন অংশ যেন এতে না থাকে। কেননা শির্ক বা পৌত্তলিকতা খোদার পছন্দ নয়। যদি কিছুটা অংশ শয়তানের থাকে তাহলে আল্লাহ্ বলেন, পুরোটাই শয়তানের। আল্লাহ্র প্রিয়রা যে দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হন তা ঐশী হিকমত এবং প্রজ্ঞার অধীনে হয়ে থাকে। তারা অর্থাৎ খোদার প্রিয়রা কষ্ট পান খোদার বিশেষ হিকমতের অধীনে নতুবা সারা পৃথিবীও যদি জোটবদ্ধ হয়ে যায় তবুও তাদেরকে তারা বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে পারবে না। তারা যেহেতু পৃথিবীতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এসে থাকেন তাই মানুষকে খোদার পথে কষ্ট সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখানো তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। নতুবা আল্লাহ্ তালা বলেন, আমার ওলীর রূহ কবয করার সময় যে দ্বিধাদ্বন্দ হয় এমন দ্বিধাদ্বন্দ আমার অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওলী বা বন্ধুর রূহ কবয করা পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা চান না তাঁর ওলী বা বন্ধুর কোন কষ্ট হোক কিন্তু প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে তাদেরকে দুঃখ দেয়া হয় আর এতে তাদের জন্য পুণ্যই অন্তর্নিহিত থাকে কেননা; এর ফলে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রকাশ পায়। যখন দুঃখ দেয়া হয় তখন হা-হুতাশ করার পরিবর্তে বা হৈ-চৈ করার পরিবর্তে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রকাশ করে। তিনি (আ.) বলেন, নবী এবং ওলীদের কষ্ট এমন নয় যাতে খোদার শাস্তি বা অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে বরং নবীরা বীরত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইসলামের প্রতি খোদার কোন শত্রুতা ছিল না কিন্তু দেখ! উহুদের যুদ্ধে হযরত রসূলে করীম (সা.) নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এর মাঝে রহস্য হলো, মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব প্রকাশিত হওয়া। অথচ হযরত রসূলে করীম (সা.) দশ হাজার মানুষের মোকাবিলায় একাই দন্ডায়মান হন যে, আমি আল্লাহ্র রসূল। অন্য কোন নবীর এমন আদর্শ তুলে ধরার সুযোগ হয়নি। তিনি (আ.) বলেন, আমরা আমাদের জামাতকে বলবো, তারা যেন শুধু এতটুকু নিয়ে গর্বিত না হয় যে, আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি বা বড় বড় অপরাধ যেমন, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি করি না। তিনি (আ.) বলেন, এসব বৈশিষ্ট্যে অধিকাংশ ভিন ধর্মের মানুষ যেমন মুশরিকরাও তোমাদের মতোই। অনেক মুশরিক আছে যারা এমন নেকী করে থাকে, তাদের চরিত্রও অনেক উন্নত। তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়ার বিষয়টি অতীব সূক্ষ্ম। একে হস্তগত করার চেষ্টা কর বা হস্তগত কর। খোদা তা'লার মাহাত্ম্য হৃদয়ে স্থান দাও। যার কর্মে বিন্দুমাত্র লোক দেখানো ভাব থাকে আল্লাহ্ তা'লা তার কর্ম তার মুখেই ছুড়ে মারেন। মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। উদাহারণস্বরূপ যদি কেউ তোমাকে বলে (তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন), তুমি কলম চুরি করেছ, তুমি তখন কেন রাগ কর? কেউ যদি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, এটি ছোট একটি অপবাদ, আমি ঐ কলম এখানে রেখেছি তুমি চুরি করেছ তখন অপরজন এর ফলে রাগ করে। তিনি বলেন, রাগ করার প্রয়োজন কি? তিনি (আ.) বলেন, তুমি তো তাক্বওয়া অবলম্বন কর বা কলম চুরি করা থেকে বিরত থাক

শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির জন্য। তোমার যে রাগ হয়েছে তার কারণ হলো, তুমি সত্যমুখী ছিলে না। তুমি যে রাগান্বিত হচ্ছ এর অর্থ হলো, খোদার সাথে তোমার সম্পর্ক ছিল না, আল্লাহ্‌র পবিত্র চেহারার দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই অনেকের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে রাগ ধরে। যদি খোদার কথা মনে থাকে তাহলে রাগ ধরার কথা নয়। যতক্ষণ মানুষের জীবনে কার্যতঃ অগণিত মৃত্যু না আসে সে মুত্তাকী হয় না। মু'জিযা এবং ইলহামও তাক্বওয়ারই শাখা। একথা স্মরণ রেখো, আসল বিষয় হলো তাক্বওয়া। তাই ইলহাম এবং স্বপ্নের পিছনে ছুটবে না। কারও প্রতি ইলহাম হয় বা রুইয়্যা অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন দেখে বা কাশ্‌ফ অর্থাৎ দিব্যদর্শন হয়, এগুলোর পিছনে ছুটবে না বরং সত্যিকার তাক্বওয়া অর্জনের পিছনে ছুটবে। এটি দেখো না যে, কে কি স্বপ্ন দেখছে, বরং এটি দেখ যে, তাক্বওয়া আছে কি না। যে মুত্তাকী হয়ে থাকে তার ইলহামও সত্য হয়ে থাকে। যদি তাক্বওয়া না থাকে তাহলে ইলহামও নির্ভরযোগ্য নয়। যতই কোন ব্যক্তি ইলহাম শোনাতে থাকুক না কেন যদি তার ভেতরে তাক্বওয়া না থাকে, মানুষের অধিকার যদি পদদলিত করে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে ক্ষেপে যায়, সে যতই সত্য স্বপ্ন শোনাক না কেন সেগুলো সত্য নয়। তিনি (আ.) বলেন, এগুলোতে শয়তানের ভূমিকা থাকতে পারে। কারো তাক্বওয়া তার ইলহামের দৃষ্টিতে যাচাই করো না বরং তার ইলহামকে তার তাক্বওয়ার অবস্থার নিরিখে যাচাই করো। সবদিক থেকে চোখ বন্ধ করে প্রথমে তাক্বওয়ার স্তরগুলো অতিক্রম কর। নবীদের উত্তম আদর্শ সামনে রাখ, যত নবী এসেছেন, সবার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল তাক্বওয়ার পথ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (সূরা আল্ আনফাল: ৩৫) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্যিকার ওলী বা বন্ধু মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ নয় কিন্তু পবিত্র কুরআন তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোও বাতলে দেয়। নবীর পরাকাষ্ঠা উম্মতেরও পরাকাষ্ঠার দাবি করে। যেহেতু মহানবী (সা.) খাতামান নবীঈন ছিলেন (সা.), তাই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুওয়তের পরাকাষ্ঠা সমাপ্ত হয়েছে। আর এরই সাথে নবুওয়তের সমাপ্তি হয়েছে। যে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং নিদর্শন দেখতে চায় এবং অলৌকিক বিষয়াদি দেখতে চায় তার জীবনকেও অলৌকিক জীবনে পরিণত করা উচিত। মহানবী (সা.) খাতামান নবীঈন, তাই খাতামান নবীঈনের মান্যকারীদেরও তাক্বওয়ার সেই মানে উপনীত হওয়া উচিত যা সর্বোচ্চ মার্গ। তিনি (আ.) বলেন, নিজেদের জীবনকে অলৌকিক জীবনে পরিণত কর। দেখ! পরীক্ষার্থী পরিশ্রম করে যক্ষা রোগীর মত দুর্বল হয়ে যায়। পড়াশুনা করতে করতে সেভাবে দুর্বল হয়ে যায় যেভাবে টিবির রোগী হয়ে থাকে।

অতএব তাক্বওয়ার পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সকল কষ্ট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত। তাক্বওয়া একটি পরীক্ষা, এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। মানুষ এই পথে যখন পা উঠায় শয়তান তার ওপর বড় বড় আক্রমণ করে, কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে শয়তান ক্লান্ত হয়ে যায়। এটিই সেই মুহূর্ত যখন মানুষের ইতর জীবনের ওপর মৃত্যু আসে আর সে খোদার ছায়ায় এসে যায়, সে খোদার বিকাশস্থল এবং আল্লাহ্‌র খলীফা হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার হলো, মানুষের সরুদয় শক্তি নিচয়কে খোদার সন্ধানে নিয়োজিত করা উচিত।

তাক্বওয়ার প্রেক্ষাপটে আবারও নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদাভীরুদের জন্য শর্ত হলো, নিজেদের জীবন বিনয় এবং দীনতার মাঝে অতিবাহিত করা। এটি তাক্বওয়ার একটি শাখা, যার মাধ্যমে আমাদের অবৈধ রাগ এবং ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। তাক্বওয়ার মাধ্যমে অনর্থক যে রাগ ধরে আর অনর্থক রাগ-ক্রোধ যদি আমাদের ওপর যদি কারো থেকে থাকে এর মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সত্যবাদীর জন্য শেষ এবং কঠিন স্তর হলো ক্রোধ এড়িয়ে চলা। কারো রাগের মোকাবিলায় তুমি স্বয়ং ক্রোধের বশীভূত হবে না।

তিনি (আ.) বলেন, অহংকার আর আত্মশ্লাঘা ক্রোধের কারণেই সৃষ্টি হয় আর কখনও স্বয়ং ক্রোধ বা রাগ, অহংকার এবং আত্মশ্লাঘার কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ কেউ কিছু বললে হঠাৎ করে মানুষ ক্ষেপে যায়, ক্ষেপার কারণ হলো সেই ব্যক্তি অহংকারী। তিনি (আ.) বলেন, রাগ তখন দেখা দেয় যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি চাই না, আমার জামাতভুক্তরা পরস্পরকে ছোট বা বড় জ্ঞান করবে বা একে অন্যের বিরুদ্ধে অহংকার করবে বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে বা কাউকে তুচ্ছ মনে করবে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্যের অভ্যাস। যার ভেতর তাচ্ছিল্যের অভ্যাস থাকে, আশঙ্কা রয়েছে, সেই বীজ বৃদ্ধি পেয়ে তার ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। যে নিজেকে কোন অর্থে বড় মনে করে এর অর্থ হলো, অন্যকে সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে বা হেয় মনে করে। তিনি কোন অর্থে বলছেন, অন্যকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা ধ্বংস ডেকে আনে। কেউ কেউ বড়দের সাথে একান্ত ভদ্রতার সাথে ও শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে, ধনী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সম্মান করে, ভদ্রতার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু বড় সে, যে দীন-হীন ব্যক্তির কথা দীনতার সাথে শোনে, মিসকীন বা দরিদ্র ব্যক্তির কথা দীনতা এবং বিনয়ের সাথে শোনে, মনোযোগের সাথে শোনে, তার মন জয় করে, তার কথার সম্মান করে। কাউকে ক্ষেপানোর জন্য কোন কথা বলা উচিত নয় যার ফলে অন্য কেউ কষ্ট পেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (সূরা আল্ হুজুরাত:১২) তোমরা পরস্পরের এমন নাম রেখো না যা রাগের কারণ হতে পারে, এটি পাপাচারী, দুরাচারী ও কদাচারিদের কাজ। যে কাউকে ক্ষেপায় সে ততক্ষণ মরবে না যতক্ষণ সে নিজে এতে ক্লিষ্ট না হবে। ভাইদের তুচ্ছ মনে করবে না, একই প্রস্রবণ থেকে যখন সবাই পানি পান কর, কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। শ্রদ্ধেয় এবং সন্মানিত কেউ জাগতিক নীতির ভিত্তিতে হয় না, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বড় সে, যে মুত্তাকী। إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (সূরা আল্ হুজুরাত:১৪)।

পুনরায় তাক্বওয়া সম্পর্কে জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, (এর বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরছেন তিনি) আল্লাহ্ তা'লা যত শক্তি-বৃত্তি দিয়েছেন, যত সামর্থ্য এবং যোগ্যতা মানুষকে দিয়েছেন তা নষ্ট করার জন্য দেয়া হয়নি। এগুলোকে ভারসাম্যের পোষাক পরিধাণ করানো এবং তার বৈধ ব্যবহারই এগুলোকে দৃঢ়তা দেয়ার নামান্তর। সততার সাথে

বৈধ স্থানে ব্যবহারই এগুলোকে দৃঢ় করা আর সঠিক ব্যবহারের ফলে এগুলো দৃঢ় হয়, উন্নতি হয়, শক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, মানুষ আরও পুণ্য করার শক্তি লাভ করে। এ কারণেই ইসলাম পুরুষত্ব নষ্ট করা বা চোখ উপড়ে ফেলার শিক্ষা দেয়নি বরং সেগুলোর বৈধ ব্যবহার এবং আত্মশুদ্ধি করা শিখিয়েছে। যৌন শক্তি বা চোখ কোন অপকর্ম করার জন্য দেয়া হয়নি। চোখের অন্যায় ব্যবহারের জন্য চোখ দেয়া হয় নি। এসব অঙ্গ বা শক্তি সামর্থ্য দিয়েছেন এই বলে যে, এগুলোর বৈধ ব্যবহার যদি কর তাহলে আত্মশুদ্ধি লাভ হবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (সূরা আল্ মু'মিনূন:২)। অনুরূপভাবে এখানেও শেষের দিকে মুত্তাকীর জীবনের চিত্রঅঙ্কন করে উপসংহার স্বরূপ বলেন, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (সূরা আল্ ইমরান: ১০৫) অর্থাৎ যারা তাক্বওয়ার পথে বিচরণ করে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, তাদের নামায দোদুল্যমান হলেও তারা নামাযকে দাঁড় করায়। মানুষ বলে, নামাযে মনোযোগ থাকে না, অনেকের জীবনে এমন অবস্থাও আসে, দোদুল্যমান হলে নামাযকে দাঁড় করায়। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে। রিপুর তাড়না সত্ত্বেও তারা কোন কিছু চিন্তা না করে অতীত এবং বর্তমান ঐশী গ্রন্থাবলীর ওপর ঈমান আনে আর অবশেষে তারা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হয়। প্রথমে অদৃশ্যে ঈমান আনে, শেষে অদৃশ্যে বিশ্বাস মানুষকে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়। এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। তারা এমন এক হিদায়াতের পথে চলে, যা অনবরত এগিয়ে যায়। যারা অনবরত চেষ্টা করে তারা সেই পথে চলে যা হিদায়াতের দিকে নিয়ে যায়, যার মাধ্যমে মানুষ সাফল্য লাভ করে। এরাই সফলকাম, যারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে আর পথের ঝুঁকি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রারম্ভেই তাক্বওয়ার শিক্ষা দিয়ে আমাদের এমন একগ্রন্থ দিয়েছেন যাতে তাক্বওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন নসীহতও করেছেন। এসব কথা বলার পর তিনি বলেন, অতএব এই দুঃখ এবং বেদনা আমাদের জামাতের সমস্ত জাগতিক দুঃখ বেদনার চেয়ে বেশি থাকা উচিত যে, তাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কি না।

এরপর তিনি (আ.) আরেক জায়গায় বলেন, যদি তোমরা চাও, উভয় জগতে সফলকাম হও আর মানুষের হৃদয়ের ওপর বিজয়ী হও, তাহলে পবিত্রতা অবলম্বন কর, বিবেক বুদ্ধি খাটাও, ঐশী গ্রন্থের দিক-নির্দেশনার অনুসরণ কর, নিজেকে সুশৃঙ্খল কর আর অন্যদের উন্নত চরিত্রের নমুনা দেখাও তাহলে অবশেষে সফল হবে। এরপর তিনি (আ.) একটি ফার্সী পঙতি পড়েন যে, কেউ কতই না উত্তম বলেছে যে, **"সুখান কায দিল বেরুঁ আয়েদ নাশিনদ লা জারাম বার দিল"** অর্থাৎ যে কথা হৃদয় থেকে উদ্ভুত হয় তা অবশ্যই হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। মু'মিনের প্রতিটি কথা হৃদয় থেকে উদ্ভুত হওয়া উচিত এবং অন্যের জন্য সেটি সাফল্যের কারণ হওয়া উচিত এটিই নিজের জন্য সাফল্য বয়ে আনে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রথমে নিজের ভেতর হৃদয় সৃষ্টি কর, যদি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চাও তাহলে ব্যবহারিক শক্তিতে শক্তিমান হও। যদি অন্যদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে হয় তাহলে প্রথমে নিজের মাঝে ব্যবহারিক শক্তি সৃষ্টি কর। নিজের হৃদয়কে প্রথমে এমন কর যেন তাতে সকল পুণ্য সৃষ্টি হয়। এরপর তা মেনেও চল, কেননা মানা ছাড়া বা আমল

ছাড়া মানুষের বক্তৃতা কোন কাজে দেয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা মৌখীকভাবে বুলি আওড়ায়, অনেকে মৌলভী এবং আলেম আখ্যায়িত হয়। মিম্বরে চড়ে নায়েবে রসূল এবং নবীদের ওয়ারিশ হওয়ার দাবী করে আর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় এবং বলে, অহংকার ও গর্ব ইত্যাদি এড়িয়ে চল কিন্তু তাদের নিজেদের কর্ম এবং তাদের যেই কুকীর্তি এর ধারণা এথেকে করতে পার যে, তাদের এসব কথার কতটা প্রভাব তোমাদের হৃদয়ের ওপর পড়ছে বা তোমাদের হৃদয়কে কতটা প্রভাবিত করছে তাদের কথা।

কথা বলার পূর্বে প্রথমে নিজে আমল কর। এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এমন মানুষ যদি কর্মশক্তিতে শক্তিমান হতো আর কাউকে বলার আগে যদি নিজে আমল করতো তাহলে কুরআনে لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (সূরা আস্ সাফ: ৩) বলার কি প্রয়োজন ছিল? এই আয়াতই বলছে, পৃথিবীতে বলে না করার বা আমল না করার মানুষ ছিল এবং আছে আর ভবিষ্যতেও হবে। অতএব কুরআনের নির্দেশ যদি মেনে চলতে হয় তাহলে এ সম্পর্কেও ভাবতে হবে। এই নসীহতকেও বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, আমাদের উচিত প্রথমে আত্মজিজ্ঞাসা করা আর এই মৌলিক নসীহত বিশেষ করে জামাতের কর্মকর্তাদের স্মরণ রাখা উচিত। যারা আশা করে, অন্যরা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনবে, নসীহতও করে, কিন্তু পরিস্থিতি দেখা দিলে নিজেদের ক্ষেত্রে তারা উল্টো কাজ করে বা বিভিন্ন বাহানা বা অজুহাত দেখায় এবং আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নির্দেশ বা রসূলের নির্দেশকে গৌণ বিষয় বলে মনে করে। এমন অনেক বিষয় আমার সামনে আসে বিভিন্ন সময়ে।

কথা এবং কর্মের সামঞ্জস্য সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন, তোমরা আমার কথা শোন আর ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও। যদি মানুষের কথা আন্তরিক না হয়, কর্মশক্তিতে সেটি শক্তিমান না হয়, তাহলে তা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। এর মাধ্যমেই আমাদের মহানবী (সা.)-এর মহান সত্যতা ফুটে ওঠে, কেননা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সাফল্য তিনি লাভ করেছেন এর কোন দৃষ্টান্ত মানব জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। আর এসব কিছু এ জন্যই হয়েছে যে, তিনি (সা.)-এর কথা এবং কর্মের মাঝে পুরো সামঞ্জস্য ছিল; আর আমাদের জন্য এটিই নির্দেশ, আমরা যেন তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করি।

আরেকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে যা জামাতের শিক্ষিত শ্রেণী এবং পিতা-মাতার বা যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে এমন যুব সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; তিনি (আ.) বলেন,

অধুনা শিক্ষিত শ্রেণী যে আরেকটি বড় সমস্যার সন্মুখীন হয় তাহলো, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এদিকে পুরো মনোযোগ দেয় না, এরপর যখন কোন বিজ্ঞানী বা কোন দার্শনিকের আপত্তি পাঠ করে তখন তাদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ এবং কুমন্ত্রণা দেখা দেয়, কোন দার্শনিক বা কোন বিজ্ঞানীর আপত্তি যখনই পাঠ করে খোদা সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে তখন বিভিন্ন সন্দেহ এবং কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাধে, তখন এমন মানুষ খ্রিস্টান বা নাস্তিক হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, এমন অবস্থায় তাদের পিতা-মাতাও তাদের ওপর অনেক যুলুম করে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য বিন্দুমাত্র সময় তাদের দেয় না আর শুরু

থেকেই জাগতিকতা এবং এমন সমস্যার মুখে ঠেলে দেয় যা তাদেরকে পবিত্র ধর্ম থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই পিতা-মাতাকে সন্তানের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত আর যুবক যুবতীদের স্বয়ং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পবিত্র কুরআন, কুরআনের তফসীর এককথায় এত বই পুস্তক রয়েছে যে, সেগুলো যদি পাঠ করা হয় তাহলে সকল আপত্তি ও কুমন্ত্রণা সহজেই দূরীভূত হতে পারে।

এরপর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য এবং ভালোবাসা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, জামাতের পারস্পরিক ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, তোমরা পরস্পর ঐক্য এবং একতা সৃষ্টি কর, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তোমরা এক সত্ত্বা হয়ে যাও নতুবা তোমাদের প্রভাব, প্রতাপ লোপ পাবে। নামাযে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ এজন্যই দেয়া হয়েছে যেন পারস্পারিক ঐক্য বজায় থাকে, বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় কল্যাণ বা মঙ্গল পরস্পরের মাঝে সঞ্চালিত হবে। যদি পরস্পর মতভেদ থাকে, ঐক্য যদি না থাকে, তাহলে দুর্ভাগাই থেকে যাবে। যদি মতভেদ থাকে তাহলে তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না, তাই মতভেদ দূর কর, ঐক্য সৃষ্টি কর। মহানবী (সা.) বলেছেন, পারস্পরিক ভালোবাসা রাখ। অন্যের অবর্তমানে তার জন্য দোয়া কর। ভালোবাসার দাবি কি? তোমরা জান বা না জান, পরস্পরের জন্য দোয়া কর, কাউকে না জানিয়েই তার জন্য দোয়া কর। যদি এক ব্যক্তি অদৃশ্যে কারো জন্য দোয়া করে তাহলে ফিরিশতা বলে, তোমার জন্যও এমনটিই হোক। অন্যরা জানে না, কে কার জন্য দোয়া করছে কিন্তু এভাবে যদি কেউ করে তাহলে ফিরিশ্তা তার জন্য দোয়া করে। তিনি (আ.) বলেন, কত মহান কথা এটি, যদি মানুষের দোয়া গৃহীত না-ও হয়, ফিরিশ্তার দোয়া তো গৃহীত হবে। আমি নসীহত করছি এবং বলতে চাই, পরস্পর যেন মতভেদ না থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি দু'টো বিষয় নিয়েই এসেছি। প্রধানতঃ আল্লাহ্র একত্ববাদ অবলম্বন কর, দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহানুভূতি প্রকাশ কর। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা অন্যদের জন্য মু'জিযা। সাহাবীদের মাঝে সত্যতার এই প্রমাণই ছিল, كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)। স্মরণ রেখো! পারস্পরিক সম্প্রীতি বা প্রীতি একটি মু'জিযা বা নিদর্শন। স্মরণ রেখো, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করে, ভাইয়ের জন্যও যদি তা পছন্দ না করে তাহলে সে আমার জামাতভুক্ত নয়। তিনি (আ.) বলেন, সে সমস্যা এবং বিপদাপদের মাঝে নিমজ্জিত-নিপতিত।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার সত্তা থেকে এক পুণ্যবান জামাত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ্। পারস্পরিক শত্রুতার কারণ কী? এর কারণ হলো কার্পণ্য, অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা আর অন্যায় আবেগ অনুভূতি। তিনি (আ.) বলেন, এমন সবাইকে (তিনি বড় বেদনার সাথে বলেছেন) যারা কার্পণ্য রাখে, অহংকারও রাখে, আত্মশ্লাঘাও রাখে, নিজের আবেগ-অনুভুতিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে না। এমন লোকদের আমি জামাত থেকে পৃথক করে দিব যারা নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং

ভালোবাসার সাথে জীবন যাপন করতে পারে না। যারা এমন তারা স্মরণ রাখবেন! তারা কয়েক দিনের অতিথি মাত্র। যতদিন পর্যন্ত উত্তম আদর্শ প্রদর্শন না করবে, আমি কারো জন্য আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হতে চাই না। এমন ব্যক্তি যে আমার জামাতভুক্ত হয়ে আমার ইচ্ছানুসারে চলে না, সে শুষ্ক শাখার ন্যায়, তাকে যদি মালী কেটে ফেলে না দেয়, তাহলে আর কি করবে। সেই শুষ্ক শাখা জীবিত শাখার সাথে থেকে পানি শুষে ঠিকই কিন্তু সেটিকে সবুজ করতে পারে না কিন্তু সেই শাখা অন্য শাখাকেও ধ্বংস করে। অতএব সাবধান থেকো; যে নিজের চিকিৎসা করবে না সে আমার সাথে থাকবে না। বাহ্যতঃ কেউ জানুক বা না জানুক কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্বল সে সেসব কথা থেকে কল্যাণ মন্ডিত হবে না বা সেসব দোয়া থেকে অংশ পেতে পারে না যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাতের সদস্যদের জন্য করে গেছেন। তাই এ বিষয়ে সব সময় সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (সূরা আলে ইমরান:৫৬) এই আশ্বাসপূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং এই আশ্বাসবাণী নাসেরায় জন্মগ্রহণকারী ইবনে মরিয়মকে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যারা তোমার অনুসরণ করে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জয়যুক্ত রাখব, প্রাধান্য দিব।

তিনি (আ.) বলেন, এ প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে ইবনে মরিয়মকেই দেয়া হয়েছিল কিন্তু আমি তোমাদের শুভ সংবাদ দিচ্ছি, ঈসা (আ.)-এর নামে আগমনকারী ইবনে মরিয়মকেও আল্লাহ্ তা'লা একই ভাষায় সম্বোধন করে শুভসংবাদ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, এখন আপনারা চিন্তা করুন, যে আমার সাথে সম্পর্ক রেখে এই মহান প্রতিশ্রুতি এবং শুভসংবাদ থেকে অংশ পেতে চায় এমন মানুষ কি সেসব লোক হতে পারে যারা রিপুর তাড়নার স্বীকার, যারা অনাচার, কদাচারে লিপ্ত? মোটেই নয়। যারা খোদার এই সত্য প্রতিশ্রুতির মূল্যায়ন করে তারা আমার কথাকে কল্প-কাহিনী মনে করে না। তাই স্মরণ রেখো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমি পুনরায় সম্বোধন করে বলছি, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আর সেই সম্পর্ক কোন সামান্য সম্পর্ক নয় বরং অসাধারণ সম্পর্ক আর সেটি এমন সম্পর্ক যার প্রভাব শুধু আমার সত্তা পর্যন্ত নয় বরং সেই সত্তা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যিনি আমাকে সেই মনোনীত মানবের উৎকর্ষ সত্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যিনি পৃথিবীতে সত্য এবং তাক্বওয়ার প্রেরণা নিয়ে এসেছেন। আমি এটিই বলব, এসব কথার প্রভাব যদি আমার সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে আমার কোন আশঙ্কা বা চিন্তা ছিল না, আমি ভ্রুক্ষেপও করতাম না কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়, এর প্রভাব আমাদের নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার মহাসম্মানিত সত্তা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অতএব এমন পরিস্থিতে আর এমন অবস্থায় মনোযোগ সহকারে শোন, এই শুভ সংবাদ থেকে যদি অংশ পেতে চাও আর যদি নিজের মাঝে এর সত্যায়নস্থল হওয়ার বাসনা রাখ আর এত বড় সফলতা অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে, এর জন্য যদি প্রকৃত পিপাসা তোমাদের মাঝে থাকে তাহলে এটিই বলবো, এই সাফল্য ততক্ষণ অর্জিত হবে না যতক্ষণ সমালোচনাকারী আত্মার স্তর থেকে

শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার পর্যায় না পৌঁছাও। এর বেশি আমি আর কিছুই বলবো না যে, তোমরা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখ, যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট, তাই তাঁর কথা হৃদয় কর্ণে শ্রবণ কর আর এর ওপর আমল করার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়ে যাও যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হও যারা গ্রহণের পর অস্বীকারের নোংরামীতে লিপ্ত হয়ে চিরস্থায়ী আযাবের শিকার হয়।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্ত সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এই কথাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত, দোয়া গৃহীত হওয়ারও কিছু শর্ত রয়েছে, কতিপয় প্রার্থনাকারীর সাথে সম্পর্ক রাখে আর কিছু যে দোয়া করায় তার সাথে সম্পর্ক রাখে। দোয়া যে করায় তার জন্য আবশ্যক হলো, খোদাভীতি এবং খোদার ভয়কে সামনে রাখা। তার ব্যক্তিগত আত্মাভিমানকে সব সময় ভয় করা আর মিমাংশা ও খোদার ইবাদতকে তার রীতি-নীতি হিসেবে রাখা, তাক্বওয়া এবং সততার সাথে খোদাকে সন্তুষ্ট করা। এমন পরিস্থিতিতেই দোয়া গৃহীত হওয়ার দ্বার খোলা হয়। যদি সে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে, খোদার সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তার দুষ্কৃতি এবং অপকর্ম দোয়ার পথে এক প্রতিবন্ধক দেয়াল হয়ে যায় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার দ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। অতএব আমাদের বন্ধুদের জন্য আবশ্যক হলো, আমাদের দোয়া নষ্ট হওয়া থেকে যেন তারা রক্ষা করে এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার পথে যেন কোন বাধ না সাধে যা তাদের অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণের ফলে সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি (আ.) বলেন, তাদের তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত কেননা; তাক্বওয়াই এমন একটি বিষয় যাকে শরীয়তের সার বা মূল বলা যায়। আর শরীয়ত যদি কেউ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে চায় তাহলে শরীয়তের মগজ বা প্রাণ হলো তাক্বওয়া। তাক্বওয়ার বহু স্তর রয়েছে কিন্তু সত্যসন্ধানী হিসেবে প্রাথমিক স্তরকে যদি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে অতিক্রম করে তাহলে সে সেই সততা এবং নিষ্ঠার কারণে মহান পদমর্যাদায় পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদা:২৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া গ্রহণ করেন। যেন এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় হয় না, যেমনটি তিনি নিজেই বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (সূরা আর্ রা'দ: ৩২)।

অতএব যেখানে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাক্বওয়ার শর্ত এক আশ্যকীয় শর্ত, তাই একজন মানুষ উদাসীন এবং পথহারা হয়ে যদি চায় যে, তার দোয়া গৃহীত হোক তাহলে সে কি আহাম্মক এবং নির্বোধ নয়। অতএব আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যক হলো, যথাসাধ্য তাদের সবার তাক্বওয়ার পথে চলা যেন দোয়া গৃহীত হওয়ার স্বাদ এবং আনন্দ পায় আর তার ঈমান বৃদ্ধি ঘটে।

তিনি (আ.) বলেন, একথা মনে করো না যে, শুধু বয়আত করলেই খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এটি হলো শুধু ছিলকা বা খোলস, মগজ বা প্রাণ থাকে ভেতরে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম হলো, বাইরে একটি ছিলকা বা খোলস থাকে আর মগজ থাকে ভেতরে। খোলস

কোন কাজের নয়, আসল বিষয় হলো, সার বা মগজ। অনেকেই এমন রয়েছে যাদের মাঝে সার বলতে কিছুই থাকে না আর মুরগির ফাকা ডিমের মত যাতে সাদা অংশও নেই আর কুসুমও নেই, যা কোন কাজের নয়, এগুলো পরিত্যাজ্য বস্তুর ন্যায় ফেলে দেয়া হয়। হ্যাঁ, দু'এক মিনিটের জন্য কোন বাচ্চার খেলার সামগ্রী হিসেবে হয়তো কাজ দিতে পারে। অনুরূপভাবে সেই মানুষ যে বয়আত এবং ঈমান আনার দাবি করে, যদি এই উভয় কথার মগজ নিজের মাঝে না রাখে তাহলে তার ভয় করা উচিত, একটি সময় আসবে যখন সে সেই ফাকা ডিমের মত টুকরো টুকরো হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে যারা বয়আত এবং ঈমান আনার দাবি করে তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত, আমি কি শুধু খোলস নাকি আমার ভেতর কোন প্রাণের স্পন্দনও আছে, যদি এটি সৃষ্টি না হয় তাহলে ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, ভালবাসা শীষ্যত্ব এবং ইসলাম গ্রহণের দাবিকারক সত্যিকার দাবিকারক নয়। তিনি (আ.) বলেন, এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌র দরবারে মগজ ছাড়া বা শাঁস ছাড়া ছিলকার কোন মূল্য নেই। স্মরণ রেখো, জানা নেই মৃত্যু কখন আসবে কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, মৃত্যু অবশ্যই আসবে। অতএব নিছক দাবির ওপর নির্ভর করো না আর আনন্দিতও হয়ো না। এটি মোটেই কল্যাণকর বিষয় গণ্য হতে পারে না। যতক্ষণ মানুষ নিজের ওপর অগণিত মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং অগণিত পরিবর্তন নিজের মাঝে না আনবে, এমন মানুষ মানব জীবনের আসল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন আমাদের জীবন তিনি (আ.)-এর বাসনা অনুসারে, ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করতে পারি আর আমাদের পদচারণা যেন প্রতিটি মুহূর্ত পুণ্যের পানে হয়। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া নষ্ট না করি বরং সেসব দোয়া যা তিনি (আ.) তাঁর জামাতের জন্য করে গেছেন সেসবের যেন সব সময় উত্তরাধিকারী হতে পারি, এই দোয়ার মাধ্যমে আপনাদের সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা এই বছরকে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও অশেষ কল্যাণের কারণ করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।